কেন ইইউ এর রেজুলেশন পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে?

২০২৪ সালে অবাধ ও সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ সরকার যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবের উপর ইউরোপীয় পার্লামেন্টে (ইইউ) আলোচনা হয়েছে যা বিভিন্ন মহলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। একই সাথে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশ সরকারকে মানবাধিকার সংস্থা-অধিকারের বিরুদ্ধে সমস্ত আইনি মামলা প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছে। বিশেষ করে এই সংগঠনের প্রধানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক দণ্ডের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ধরণের আলোচনা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমানা পেরিয়ে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেগ করেছে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য প্রশংসনীয় প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তবে একটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধরনের একটি রেজোলিউশন সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় কিনা তা মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।
এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলি তাদের কাজের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই সংস্থাগুলি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নজরদারি করতে পারে। যাইহোক, বাংলাদেশে মানবাধিকার সংস্থা-অধিকার এর মামলাটি ২০১৩ সালের হেফাজতে ইসলামীর সমাবেশে মৃত্যুর সংখ্যা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচারের অভিযোগকে ঘিরে। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলিসহ যে কোনও সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা তাদের দেওয়া তথ্যের নির্ভুলতার উপর নির্ভর করে। যদি এটি প্রমাণিত হয় যে অধিকার মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করেছে, তাহলে এটি নৈতিক ও আইনগত উদ্বেগ বাড়ায়।
অনেক মিডিয়া হাউস সেই সময় অধিকারের দাবির বিষয়ে স্বাধীন অনুসন্ধান চালিয়ে তাদের প্রকাশিত তালিকায় অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছিল। মৃত হিসাবে তালিকাভুক্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে জীবিত পাওয়া গেছে তাদের অনুসন্ধানে। ফলে এই ধরণের কার্যক্রম মানবাধিকার সংস্থাগুলির দ্বারা প্রচারিত তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পাশাপাশি যে কোনও সম্ভাব্য অসদাচরণ মোকাবিলার জন্য একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। সেই সময়ে অধিকারের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্যের বিস্তার শুধু সরকারের সুনামই নষ্ট করেনি বরং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে অসন্তোষের

অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল।
তাই, অধিকারের বিরুদ্ধে আইনি মামলা প্রত্যাহারের জন্য ইইউ পার্লামেন্টের আবেদনকে বাংলাদেশের আইনের শাসনকে সম্মান করার প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করা এবং আইনি ব্যবস্থার পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তকে সম্মান করার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। যদি অধিকারের পদক্ষেপগুলি বাংলাদেশের আইন লঙ্ঘন বলে মনে করা হয়, তাহলে সরকারের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার রয়েছে। ইইউ পার্লামেন্ট ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের নীতিগুলিকে সমুন্নত রেখে স্বচ্ছ ও ন্যায্যভাবে আইনি কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করতেই পারে। তবে, আইনি অভিযোগ খারিজ করার অনুরোধ করা যুক্তিযুক্ত নয়।
অধিকারের মামলাটির মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার সংস্থার জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসনের মধ্যে জটিল সমীকরণের বিষয়টিকে তুলে ধরেছে। ফলে, তারা যেমন প্রত্যাশা করতে পারে যে একটি আইনি পদক্ষেপ ন্যায্যতা ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলবে, ঠিক তেমনি ভাবে ইইউ পার্লামেন্টের বাংলাদেশ সম্পর্কিত যে কোন ধরণের রেজুলেশন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং এর আইনি ব্যবস্থার প্রতি সম্মান জানানোর মাধ্যমে নেওয়া উচিত। তাই, একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানিয়ে ইইউকে কেন আরও গঠনমূলক পন্থা অবলম্বন করা উচিত সেই বিষয়টি এই নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।
বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র যার নিজস্ব সরকার, সংবিধান এবং আইনি কাঠামো রয়েছে। একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপকে তার সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ইইউ-এর জন্য আন্তর্জাতিক আইনের নীতি এবং জাতির সার্বভৌমত্বকে সম্মান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে গঠনমূলক সম্পৃক্ততা এই উদ্বেগগুলি মোকাবিলায় আরও উপযুক্ত উপায় হতে পারে।
সংঘাতপূর্ণ হিসাবে দেখা যেতে পারে এমন রেজুলেশন জারি করার পরিবর্তে, ইইউকে বাংলাদেশ সরকারের সাথে সংলাপ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। দ্বিপাক্ষিক আলোচনাকে উৎসাহিত করা মানবাধিকার সমস্যা সমাধানের জন্য আরও ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক পদ্ধতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। এ ধরনের সংলাপ ইইউকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের জটিলতাকে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ করে দিতে পারে।
ইইউ বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সংগঠনগুলিকে তাদের সমর্থন চালিয়ে যেতে পারে। মানবাধিকার রক্ষার জন্য এই সংস্থাগুলির প্রচেষ্টা দেশের মানবাধিকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, সুশীল সমাজকে তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পদ, প্রশিক্ষণ এবং প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করা ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা

করতে পারে। তবে, তারা যদি কোন ভুল কাজ করে তবে তাদের সাথে যুক্ত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ঠিক নয়।
বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক অনুঘটক। ইইউ-এর যে কোনো একতরফা পদক্ষেপের জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েন আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের সাথে ভাল কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং আঞ্চলিক সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য কাজ করা ইইউ এর দায়িত্ব।
সুতরাং, ইইউ উচিৎ তাদের পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করার মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে আরো গঠনমূলক এবং কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে মানবাধিকার বিষয়ক কোন সমস্যা থাকলে তার সমাধানের বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনা করা। অন্যথায়, এ ধরনের উদ্যোগকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অযাচিত অনুপ্রবেশ হিসেবে দেখা হতে পারে। ইইউ এর উচিত কূটনৈতিক চ্যানেলে বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্মানজনক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সমাধানগুলি খুঁজে বের করা। একতরফা সিদ্ধান্ত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে এবং দেশের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
মানবাধিকারের পক্ষে ওকালতি করা এবং একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের মধ্যে পার্থক্যে বিষয়টি সম্পর্কে সকল পক্ষকে সচেতন থাকতে হবে। তাছাড়া, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা চ্যালেঞ্জিং হবে। যাইহোক, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির উচিত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে সতর্ক হওয়া। তাদের উচিত কোন দেশের মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার সময় সেই দেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করা।
লেখক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রফেসর।

দূরদর্শী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও স্মার্ট বাংলাদেশ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল দেশে পৌঁছে দিতে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই লক্ষ্য পূরণে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ

রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়ন এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়তে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ’ তৈরি করা হয়েছে। এর চারটি স্তম্ভ রয়েছে: স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট গভর্নেন্স।

বাংলাদেশ একটি দেশ তার স্থিতিস্থাপকতা এবং দ্রুত উন্নয়নের জন্য পরিচিত, এখন তার পরবর্তী মিশন শুরু করছে: একটি স্মার্ট বাংলাদেশ হওয়া। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এই মিশনের লক্ষ্য জাতিকে একটি ডিজিটালভাবে উন্নত, সংযুক্ত এবং টেকসই সমাজে রূপান্তর রাখতে সক্ষম।

স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনের একটি মৌলিক স্তম্ভ হল ডিজিটাল অবকাঠামোর উন্নয়ন। এর মধ্যে রয়েছে সারা দেশে উচ্চ-গতির ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ, যাতে প্রত্যেক নাগরিকের ডিজিটাল বিশ্বে অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করা। ডিজিটাল বিভাজন দূর করার মাধ্যমে, সরকার ব্যক্তি, ব্যবসা এবং সম্প্রদায়কে ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করতে এবং প্রচুর তথ্য ও পরিষেবা অ্যাক্সেস করার জন্য ক্ষমতায়নের লক্ষ্য রাখে।

শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিশনটি ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়াসহ শিক্ষায় প্রযুক্তির একীকরণের উপর জোর দেয়। তরুণ প্রজন্মকে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতায় সজ্জিত করার মাধ্যমে, বাংলাদেশ একটি প্রযুক্তি-বুদ্ধিমান কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে পারে যারা উদ্ভাবন চালাতে এবং বৈশ্বিক ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপে অবদান রাখতে সক্ষম।

স্বাস্থ্যসেবা খাতে, স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনের লক্ষ্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার অ্যাক্সেস উন্নত করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা। টেলিমেডিসিন, রিমোট ডায়াগনস্টিকস, এবং ডিজিটাল হেলথ রেকর্ডস হল কিছু উদ্যোগ যা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বাড়ানোর জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডাক্তারদের সাথে রোগীদের সংযুক্ত করার মাধ্যমে, স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি এমনকি দেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত কোণে পৌঁছাতে পারে, জীবন বাঁচাতে পারে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ফলাফলের উন্নতি করতে পারে।

১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার

দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য-৪ অর্জন এবং মাতৃমৃত্যু, টিকাদান কভারেজ এবং ম্যালেরিয়া থেকে বেঁচে থাকার হারের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলিকে উন্নত করে, জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চিত্তাকর্ষক সাফল্য অর্জন করেছে। গত চার দশকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেশ কয়েকটি সংস্কারের মধ্য দিয়ে গেছে এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই একটি বিস্তৃত স্বাস্থ্য পরিষেবা অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। বেসরকারি-খাতের পরিষেবাগুলি অনেকের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং স্বাস্থ্যসেবার জন্য পকেটের বাইরে ব্যয় বেশি। এই চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে বিপ্লবীকরণ এবং বিদ্যমান বাধাগুলিকে মোকাবেলা করার, যার ফলে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা ইকোসিস্টেমের পথ প্রশস্ত করা।

মিশনটি শহরগুলিকে স্মার্ট শহরে রূপান্তরিত করার দিকেও জোর দেয়। এতে বুদ্ধিমান পরিবহন ব্যবস্থা, দক্ষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্মার্ট এনার্জি গ্রিড সহ স্মার্ট পরিকাঠামো বাস্তবায়ন জড়িত। ডেটা এবং সংযোগের সুবিধার মাধ্যমে, শহরগুলি বাসযোগ্যতা, স্থায়িত্ব এবং দক্ষতা বাড়াতে পারে, শেষ পর্যন্ত নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে। সরকারি অফিসে ইলেকট্রনিক ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ই-নোথি) কাগজবিহীন অফিস ইকোসিস্টেমের দিকে একটি প্রাথমিক অগ্রগতি চিহ্নিত করে। এই ব্যবস্থাটি কেবল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে সুবিন্যস্ত করেনি বরং কাগজপত্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে, যার ফলে দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমাগত বিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, সরকার ডিজিটাল নোথি সিস্টেম (ডি-নোথি) চালু করেছে, ডিজিটাল রূপান্তরকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাচ্ছে।

একটি কাগজবিহীন অফিস এবং জনসেবা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্যকে একটি স্মার্ট নেশন হওয়ার দিকে দেশের যাত্রার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে দেখা যেতে পারে। সরকারের দূরদর্শিতা, প্রযুক্তিগত গ্রহণের প্রতিশ্রুতির সাথে, দেশকে ডিজিটাল রূপান্তরের আলোকবর্তিকা হিসেবে স্থান দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ যখন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে, তখন স্মার্ট বাংলাদেশ এমন একটি ভবিষ্যৎ কল্পনা করে যেখানে দক্ষতা, অন্তর্ভুক্তি এবং স্থায়িত্বের অভূতপূর্ব উচ্চতা অর্জনের জন্য সমস্ত সেক্টরে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হয়।

ই-গভর্নেন্স স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সরকারি পরিষেবা এবং প্রক্রিয়াগুলিকে ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে, দুর্নীতি হ্রাস করা যেতে পারে এবং নাগরিক-সরকার মিথস্ক্রিয়াকে সুবিন্যস্ত করা যেতে পারে। নাগরিক পরিষেবা, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম এবং স্বচ্ছ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়াগুলির জন্য অনলাইন পোর্টালগুলি আরও নাগরিক-কেন্দ্রিক এবং জবাবদিহিমূলক সরকার গঠনের জন্য নেওয়া কিছু উদ্যোগ।

স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনও উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবনের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। একটি প্রাণবন্ত স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য স্টার্ট-আপ ইনকিউবেশন সেন্টার, প্রযুক্তি পার্ক এবং বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বাংলাদেশ প্রযুক্তি-চালিত ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে তার সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করতে পারে, বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে এবং নাগরিকদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

যাই হোক, স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনের সাফল্য নির্ভর করে সরকার, বেসরকারি খাত, শিক্ষাবিদ এবং নাগরিকদের মধ্যে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের উপর। এটি একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করার জন্য একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন যা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, প্রযুক্তিকে আলিঙ্গন করে এবং পরিবর্তনশীল ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপের সাথে খাপ খায়।

একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মিশন ভবিষ্যতের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে, বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করার, উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার এবং একটি ডিজিটালি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে। ডিজিটাল অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট শহর, ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্যোক্তাদের উপর ফোকাস দিয়ে, বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য একটি উন্নত, স্মার্ট ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা কাজ করবো।

লেখক: প্রভাষক, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

কৃষিতে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্য

২০১৭ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ কোটি ৯৭ লাখ। যা ২০২২ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটি ৮১ লাখের কিছু বেশি। অর্থাৎ পাঁচ বছরে দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে ৫ দশমিক ২৯ শতাংশ। কিন্তু এই সময়ে জমি বাড়েনি। এর ওপর করোনা পরিস্থিতি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা। অনেক বিশেষজ্ঞ আশঙ্কা করেছিলেন, বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে। কিন্তু বর্তমান সরকারের দূরদৃষ্টি পদক্ষেপ আর কৃষকদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশ্বের গড় কৃষি উৎপাদনকে পেছনে ফেলে উপরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ২২টি ফসল উৎপাদনে বিশ্বসেরা ১০ দেশের মধ্যে অবস্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ।

কৃষিপণ্যে বিশ্বের শীর্ষ দশে বাংলাদেশ
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, জলমগ্নতা, নদী ভাঙ্গনসহ বৈরী আবহাওয়া; কৃষিজমি কমে যাওয়া; জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বসেরা। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) এর হিসেব মতে, আয়তনে বিশ্বে ৯৪তম দেশ হলেও বাংলাদেশ নিম্নোক্ত ২২ ধরনের ফসল উৎপাদনে শীর্ষ দশে অবস্থান করছে।

এফএও এর মোট ১৬২টি প্রাথমিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের তালিকায় বাংলাদেশের ৬৮ ধরনের কৃষিপণ্য স্থান পেয়েছে। এ তালিকায় যেমন একক পণ্য আছে, তেমনি সমজাতীয় ও মৌসুমভিত্তিক কয়েকটি পণ্যও আছে। এফএওর হিসাবে, ২০০১ সালে ১১টি পণ্য উৎপাদনে শীর্ষ দশে ছিল বাংলাদেশ। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় এ সংখ্যা আর বাড়েনি। তবে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় এলে ২০১১ সালে পণ্য উৎপাদনে শীর্ষ দশে স্থান পায় ১৭টি কৃষি পণ্য। এরপর বিভিন্ন বছরে যোগ হয় আরও পাঁচটি কৃষিপণ্য – পেঁয়াজ, কুমড়া, ফুলকপি ও ব্রকলি, পাখির খাদ্য (বীজ) এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত শিমের বিচি। সব মিলিয়ে ২০২১ সালে ২২টি পণ্য উৎপাদনে শীর্ষ তালিকায় স্থান

পেয়েছে বাংলাদেশ।

২২টি কৃষিপণ্যের মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পাট, সুপারি ও শুকনা মরিচ উৎপাদনে। চাল, রসুন। চিনি জাতীয় ফসলে (যেমন জোয়ার) বাংলাদেশ তৃতীয়। জাম, বরই, করমচা, লটকন ইত্যাদি বেরিজাতীয় ফল এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত সুগন্ধি মসলায় চতুর্থ। মসুর ডাল ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল (কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি) উৎপাদনে বাংলাদেশ ষষ্ঠ। সপ্তম অবস্থানে রয়েছে পেঁয়াজ, আলু, আদা, বেগুন, শিমের বিচি ও নারকেলের ছোবড়া উৎপাদনে। চা ও কুমড়ায় বাংলাদেশ অষ্টম। আম, পেয়ারা ও গাবজাতীয় ফল, ফুলকপি ও ব্রকলি এবং মটরশুঁটি ও পাখির খাদ্য (বীজ) শ্রেণিতে বাংলাদেশের অবস্থান নবম।

সব মিলিয়ে এফএওর হিসেবে আয়তনে ছোট (বিশ্বের ৯৪তম) হলেও প্রাথমিক কৃষিপণ্য (শুধু ফসল) উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৪তম। শীর্ষে রয়েছে চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র। এফএওর তথ্যানুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের পরিমাণ ৯ কোটি ৩৩ লাখ টন যার বাজার মূল্য ছিল ৩ হাজার ৬১১ কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় চার লাখ কোটি টাকার সমান।

প্রধান কিছু ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশের অগ্রগতি বেশ ভালো। আমন, আউশ ও বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলনে বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। কৃষির এ সাফল্য সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশ্বে গড় উৎপাদনশীলতা প্রায় তিন টন। আর বাংলাদেশে তা ৪ দশমিক ১৫ টন। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ শ্রীলংকায় প্রথমবারের মতো চাল রফতানি শুরু করে সরকার। দুই দফায় প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করা হয়। এছাড়া ৬ মে ২০১৫ বাংলাবান্ধা বন্দর দিয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প কবলিত নেপালে ১০ হাজার টন চাল সাহায্য হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এটা দেশের চাল উৎপাদনের সামর্থ্যরেই বহিঃপ্রকাশ।

দুই দশক আগে আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ ছিল ২০তম দেশ। এরপর কানাডা, তুরস্ক, পোল্যান্ডের মতো ১৩টি দেশকে একে একে পেছনে ফেলে ৭ নম্বরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। এফএওর তথ্য বলছে, ২০২১ সালে বাংলাদেশে আলু উৎপাদিত হয়েছে ৯৮ লাখ টন। মরিচ (শুকনা) উৎপাদনে ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। এক দশকে চীন ও থাইল্যান্ডকে পেছনে ফেলে মরিচ উৎপাদনে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠেছে বাংলাদেশ। কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ও করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাবে,

২০২১-২২ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে প্রায় ১১৩ কোটি মার্কিন ডলার। সবজি, শুকনা খাবার, মসলা, সুগন্ধি চাল ইত্যাদি কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ১১৬ কোটি ডলারের বেশি। গেল ১৪ বছরে কৃষিতে যে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে এর অন্যতম কারণ সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেন।

কৃষি উপকরণ সহায়তা: বর্তমান সরকারের প্রবর্তিত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ১ কোটি ৮২ লাখ কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে, যা দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের অনুসরণে ভারত সরকার কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে।

সারের ভর্তুকি ও সরবরাহ: বর্তমান সরকার ভর্তুকি দিয়ে চার দফায় সারের দাম কমিয়েছে। গেল সাত বছরে ৪৫.৪৮ লাখ মেট্রিক টন সার আমদানির বিপরীতে ৪২.৪৭ লাখ মেট্রিক টন সার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া সার গুদামের ধারণক্ষমতা ৯৮ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১.৫৪ লাখ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করা হয়েছে।
সেচ ভর্তুকি ও কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট: মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেচের পানির ভর্তুকির টাকা সরাসরি কৃষকের একাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়। কৃষি যন্ত্রপাতির ভর্তুকি: দেশের হাওড় ও চরাঞ্চলে ৭০ শতাংশ এবং অন্যান্য অঞ্চলে ৫০ শতাংশ ভর্তুকিতে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, হারভেস্টরসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে।

কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম: কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। আউশে প্রণোদনা প্যাকেজও দিচ্ছে সরকার।

দুর্যোগ সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবন: বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনে শীর্ষে বাংলাদেশ। ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সফলতাও বাড়ছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) বেশ কয়েকটি জাত ছাড়াও এরই মধ্যে পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) বিজ্ঞানীগণ মোট ১৩টি প্রতিকূল পরিবেশে সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে লবণসহিষ্ণু নয়টি, খরাসহিষ্ণু দুটি ও বন্যাসহিষ্ণু চারটি ধানের

জাত। ২০১৩ সালে বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকগণ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এতগুলো প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের দিক থেকেও বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ২০১৩ সালে সর্বপ্রথম জেনেটিকেলি মোডিফাইড ফসল বিটি বেগুনের চারটি জাত অবমুক্ত করে। যার মধ্যে বেগুনের প্রধান শত্রু ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী জীন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মাধ্যমে আলুর নাবি ধসা রোগের প্রতিরোধী জিন প্রতিস্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে।

সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রীকৃত, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সব শ্রেণির কৃষকদের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, যাতে টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণসহ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, ইত্যাদিসহ বিভিন্ন রেসরকারি প্রতিষ্ঠানও দক্ষ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা দিয়ে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নকে তরান্বিত করেছে।

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ই-কৃষি: তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ই-কৃষি এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা কৃষকের জীবনযাত্রা উন্নয়নে খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার জানালা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে সারাদেশে ৭২৭টি কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে ২৪৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করেছে। এছাড়া ২৮ অক্টোবর ২০১৫ ইনফো-সরকার ২৫৪টি উপজেলার ২৫৪টি আইপিএম/ আইসিএম কৃষক ক্লাবকে এআইসিসিতে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি তথ্যকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনলাইনে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের ১৬১২৩ নম্বরে যে কোনো মোবাইল থেকে ফোন করে নামমাত্র খরচে কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য বিষয়ে কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে। মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট অফলাইন/অনলাইনে সার সুপারিশ নির্দেশিকা প্রদান করছে। আখ চাষিরা মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে ই-পুর্জি সেবা গ্রহণ করছেন। এমনকি ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও দেশ-বিদেশের কৃষি তথ্য সেবা পাওয়া যাচ্ছে। ‘কৃষকের জানালা’ নামক মোবাইল এপস

এর মাধ্যমে কৃষকগণ ছবি দেখে ফসলের রোগ ও পোকামাকড় সনাক্তকরে প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে। টেলিভিশন, রেডিও, কমিউনিটি কৃষি রেডিও এর মাধ্যমে কৃষকগণ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা পাচ্ছে।

শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি: দুই যুগ আগেও বাংলাদেশের অর্ধেক এলাকায় একটি ও বাকি এলাকায় দুটি ফসল হতো। বর্তমানে দেশে বছরে গড়ে দুটি ফসল হচ্ছে। সরকারের যুগোপোযোগী পরিকল্পনা, পরিশ্রমী কৃষক এবং মেধাবী কৃষি বিজ্ঞানীদের স্বল্প আয়ুষ্কালসম্পন্ন জাত উদ্ভাবণ ও সম্প্রসারণবিদদের সম্প্রসারণ সেবা, ইত্যাদি যৌথ প্রয়াসে দেশে শস্যের নিবিড়তা এখন ১৯৭%, কোন কোন উপজেলায় শস্যের নিবিড়তা এখন ২৫০% এর বেশি।প্রতিবছর আবাদী জমির পরিমান কমে যাওয়া ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও বর্তমান জনগণবান্ধব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ১৩১৪ ডলার এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ দশমিক ৫১ শতাংশ (এ যাবৎ কালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ)। কৃষিতে বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন বিশ্বের যে কোনো উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ।

বাংলাদেশের কৃষির এ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং এ দেশের কৃষি ও কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারের ধারাবাহিতকাও অপরিহার্য।

লেখক: অধ্যাপক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সরকার বিদ্যুতের আলো জ্বালাবে আরও দুর্গম দ্বীপে

দেশের পটুয়াখালি জেলার বিচ্ছিন্ন উপজেলা রাঙ্গাবালি একসময় ছিল অন্ধকারে। ভরসা ছিল শুধু সৌর বিদ্যুৎ, মোমবাতি কিংবা হারিকেনের আলোতে। সদর উপজেলা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে বিচ্ছিন্ন এই উপজেলায় নদীর তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে সরকার। আর তাতে পাল্টে গেছে রাঙ্গাবালির অর্থনীতি। কলকারখানা থেকে শুরু করে নতুন নতুন ব্যবসার দ্বার খুলে গেছে

সেখানে। একই সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে দেশের আরও তিনটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। সেগুলো হচ্ছে- হাতিয়া, নিঝুমদ্বীপ এবং কুতুবদিয়ায়। এর মধ্য দিয়ে এই তিন জনপদে নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ ও সেবার গুণগত মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে নেওয়া এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকে অনুমোদন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন – ‘কেউ অন্ধকারে থাকবে না, সব ঘরেই আলো জ্বলবে’। তারই প্রতিফলন এসব দুর্গম এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্যোগ।

রাঙ্গাবালী উপজেলার মানুষ সূর্য ডোবার পর ঘর থেকে বের হতেন খুবই কম। নিম্ন আয়ের মানুষ কুপি জ্বালিয়ে এবং মধ্যম আয়ের মানুষ সোলার প্যানেলের মাধ্যমে কোনোরকম একটি বাতি জ্বালাতেন। গরমে ফ্যান পর্যন্ত চালানোর উপায় ছিল না। অন্ধকারে থাকা এই উপজেলার মানুষ তাই আলোর খোঁজে পাড়ি জমাতেন শহরের দিকে। দুর্গম এই এলাকার মানুষ বিদ্যুৎকে মনে করেন স্বপ্নে দেখা এক আকাঙ্ক্ষা, যা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তবে মানুষের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। পুরো উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছে।

নিঝুমদ্বীপ নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের ছোট্ট একটি দ্বীপ। প্রায় ১৪ হাজার ৫০ একর আয়তনের এই দ্বীপটি শীতকালে পর্যটকদের জন্য অন্যতম একটি গন্তব্য। শীতকালে হাজারো অতিথি পাখির আগমন ঘটে। এছাড়া হরিণ দেখার জন্য প্রতিবছর এই দ্বীপে অসংখ্য পর্যটক ছুটে আসেন, করেন রাত্রি যাপন। তবে বিদ্যুৎ না থাকায় তেমন কোন সুযোগ সুবিধা পায়নি এই দ্বীপে আসা পর্যটকরা। সন্ধ্যা হলে বাজারে জ্বলে সৌরবিদ্যুতের আলো, আর তার সঙ্গে অনেকেই লাইনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করেন মোবাইলে চার্জ দেওয়ার জন্য। এই দ্বীপে বিদ্যুৎ পৌঁছালে সাধারন মানুষের জীবনমানের এমন পরিবর্তন আসবে যা আগে কেউ কল্পনা করেনি। বিদ্যুতের ফলে পর্যটকদের জন্য বাড়বে ভালোভাবে থাকার সুবিধা, যা এখন খুবই সামান্য। পর্যটকের আনাগোনা বাড়লে দ্বীপের মানুষের অর্থনৈতিক ভাগ্য ঘুরে দাঁড়াবে।

আয়তন ও জন সংখ্যার দিক থেকে হাতিয়া উপজেলা নোয়াখালী জেলার একটি বৃহত্তম উপজেলা। ২১০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দ্বীপাঞ্চলে

যেতে পাড়ি দিতে হয় বিশাল জলরাশি। এখানে বাস করেন সাড়ে চার লাখেরও বেশি মানুষ। হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপের একটি বড় অংশ ছিল বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত। তাই পর্যটকদের জন্য বিশেষ কোন সুবিধা এমনকি রাত্রিযাপনের জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না।

সাগরকন্যা হিসেবে পরিচিত কুতুবদিয়া কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত একটি দ্বীপ উপজেলা। নানান রকম বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ এই দ্বীপটির আয়তন প্রায় ২১৬ বর্গ কিলোমিটার। এই দ্বীপে রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সমুদ্র সৈকত, লবণ চাষ, বাতিঘর এবং কুতুব আউলিয়ার মাজার। এখানেও বিভিন্ন সময়ে পর্যটকরা যাতায়াত করেন। তবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং সুযোগ সুবিধা কম থাকায় সেখানে দিনে গিয়ে দিনে চলে আসেন বেশিরভাগ পর্যটক।
‘হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)।

সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে জোগান দেওয়া ৩৮৪ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি চলতি ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে শতভাগ বাস্তবায়নের কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। এ কারণে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বাড়িয়ে ২০২৫ সালের জুলাই মেয়াদে শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করে একনেক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, হাতিয়া দ্বীপ শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা, সাবমেরিন ক্যাবল দ্বারা মুকতারিয়া-নিঝুমদ্বীপ খাল পারাপার করে নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া চ্যানেল পারাপার করে কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা এবং হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপের শতভাগ গ্রাহককে নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

এদিকে পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানিয়েছে, প্রকল্পের কর্মপরিধিতে পরিবর্তন ও বিভিন্ন অঙ্গে ব্যয় কমানো-বাড়ানো এবং প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব করায় প্রকল্পে সংশোধনী এনেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। সংশোধিত প্রস্তাবে প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৩ সালে থেকে বাড়িয়ে ২০২৫ সাল এবং ব্যয় ৩৮৪ কোটি ৩৬ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৪৭ কোটি ১২ লাখ টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ ৫৯৭ কোটি ১২ লাখ ২০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) নিজস্ব তহবিল থেকে জোগান দেবে ৫০ কোটি টাকা।

নোয়াখালী ও কক্সবাজার জেলার হাতিয়া ও কুতুবদিয়া উপজেলা জুড়ে বাস্তবায়িত হবে প্রকল্পটি।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্র আরও জানিয়েছে, প্রকল্পের আওতায় নতুন ৪টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ (হাতিয়া দ্বীপে ৩টি ও কুতুবদিয়া দ্বীপে ১টি), মুকতারিয়া-নিঝুমদ্বীপ খালে দেড় কিলোমিটার ১১ কেভি সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করা হবে। কুতুবদিয়া চ্যানেলে ৫ কিলোমিটার ডাবল সার্কিট ৩৩ কেভি সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করা হবে। নতুন মোট ১ হাজার ৪৮৬ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হবে। বিদ্যমান ৩৫ কিলোমিটার বিতরণ লাইন রেনোভেশন করা হবে। মোট ৩ হাজার ২৫০টি পোল মাউন্টেড বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হবে এবং অফিস ভবন কাম রেস্ট হাউজ, ডরমিটরি, সীমানা দেওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে।

একনেকের অনুমোদন সুপারিশ করে পরিকল্পনা কমিশনের মতামতে বলা হয়েছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) আওতাধীন হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়ন নিশ্চিত করে নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ ও সেবার গুণগত মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

তৃতীয় বৃহত্তম বাজার হবে বাংলাদেশ! বিশ্বজুড়ে হৈচৈ

বাংলাদেশ হবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বাজার! জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের পরেই জায়গা হবে লাল-সবুজের বাংলাদেশ। এই কথাটি বলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু কিসের জোরে? ১৭ কোটি জনসংখ্যার এই দেশ কোন ম্যাজিকে রাতারাতি বিশ্বের নজর কাড়বে? উত্তর রয়েছে শেখ হাসিনার কথায়। নদী ঘেরা আজকের বাংলাদেশ সাজছে উন্নত স্মার্ট রূপে। তাই আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশকে নিয়ে একটু বেশি হৈচৈ হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট দেশ হলেও, প্রাকৃতিক সম্পদে ঠাসা বাংলাদেশ। তাই তো এখানে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্র নেতাদের আনাগোনা একটু বেশি। তার উপর বঙ্গোপসাগরের গা ঘেঁষে থাকা ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির অংশ হওয়ায় বিশ্ব ভূ রাজনীতিতে বাংলাদেশে কদর খানিকটা বেশি। এবার সেই দেশ হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম বাজার, কিন্তু কীভাবে?

বাংলাদেশের বাজারটা অনেকটা বড়। আর সেই বাজারকে গোটা বিশ্বের কাছে আকৃষ্ট করতে চাইছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। তাই তো কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই এমন কথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় ৩০০ কোটি মানুষের বাজারের কেন্দ্রস্থলে। এছাড়া, আমাদের রয়েছে ১৭ কোটি মানুষ। যার বৃহৎ অংশ যুবসমাজ। বাংলাদেশের সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রায় ৭০ শতাংশই আসে পুনঃবিনিয়োগ থেকে। এ থেকে প্রমাণ হয় বাংলাদেশে বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ বিদ্যমান।’

ভৌগোলিক ভাবে বাংলাদেশ রয়েছে ৩০০ কোটি মানুষের বাজারের কেন্দ্রবিন্দুতে। বাংলাদেশেও প্রায় ১৭ কোটি মানুষের বসবাস। স্বাভাবিকভাবেই গোটা বিশ্বর কাছে বাংলাদেশ একটা আকর্ষণীয় বাজার। এই ব্যাপারটাকেই টার্গেট করতে চাইছেন শেখ হাসিনা। তাঁর কথায়, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বিত্তশালী ব্যক্তির জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে তিন কোটিতে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ টক্কর দেবে জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যকে। হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বাজার। তাই উন্নয়নে অবদান রাখতে আগ্রহী, এমন বিনিয়োগকারীর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তোলার অপেক্ষা করছেন তিনি।

এব্যাপারে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, ‘তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় এ দেশের অর্থনীতিকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, সেই কিসিঞ্জার যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিই এখন বাংলাদেশের

উন্নয়ন দেখে বিস্মিত হতেন। এখন আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ব করে বলতে পারি সেই তলাবিহীন ঝুড়ি আজ বিশ্বের বিস্ময়, উন্নয়নের এক রোল মডেল।’

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, ‘বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক দূর এগিয়েছে। স্বাধীনতার সময়ে অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে পাকিস্তান এগিয়েছিল। প্রতিটি সূচকেই তারা বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে আছে। এটিই আমাদের স্বাধীনতার বড় অর্জন।’

বাংলাদেশে এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটা উচ্চমানের বিনিয়োগ প্রয়োজন। তাঁর কথায়, বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এখন সব রকম খাতই খোলা। কৃষিপণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চিকিৎসা সরঞ্জাম,অটোমোবাইল থেকে শুরু করে জাহাজ নির্মাণ ও আইসিটি খাতে দুর্দান্ত বিনিয়োগ করা যাবে। বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশ সহজ পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নিতে পারবেন আপন দেশে।

আগ্রহ বাড়াতে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে তৈরি হয়েছে প্রায় ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ১০৯ টি হাইটেক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক সহ আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার। পাশাপাশি আধুনিক পরিকাঠামোতে সাজছে স্থল, রেল এবং বিমান যোগাযোগ। বাংলাদেশের অধিকাংশ মহাসড়কই চার কিংবা তার থেকেও বেশি লেনে উন্নীত করা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ টি জেলাকে ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করেছে পদ্মা সেতু। খুব শিগগিরই সেতুর মাধ্যমে সূচনা হবে ঢাকা এবং খুলনার রেল যোগাযোগ। অপরদিকে প্রস্তুত কর্ণফুলী আন্ডারওয়াটার টানেল, এই ধরনের অবকাঠামো দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম। স্বপ্নের পর্যটন নাগরিক কক্সবাজারের সঙ্গে দ্রুত সংযুক্ত হবে চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ। আপাতত লক্ষ্য, ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞান ভিত্তিক এবং উন্নত স্মার্ট দেশে পরিণত করা। ২১০০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ হয়ে উঠবে বাংলাদেশ। হাঁ হয়ে দেখবে পুরো বিশ্ব।

` প্রধানবিচারপতির নিয়োগ

প্রক্রিয়া নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলছেন তারা নির্বোধ’

সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে ওবায়দুর হাসানকে নিয়োগ দেওয়ার পর থেকে বিরোধী শিবির থেকে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। ‘রাষ্ট্রপতি নেই দেশে, সেসময় কেনো নিয়োগ’, ‘বর্তমান প্রধান বিচারপতি থাকতেই নতুন প্রধান বিচারপতি নিয়োগ’ এধরনের তথ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা রকম গুজব-মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি ও আইনজ্ঞরা বলছেন, যারা আইন জানে না তাদের মুখে আইনের ব্যাখ্যা শুনলে তা ক্ষতিকর।

এর আগে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এই নিয়োগ দিয়েছেন। এই নিয়োগ শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকর হবে। বাংলাদেশের ২৪তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বিদায়ী প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর স্থলাভিষিক্ত হবেন। বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৫ সেপ্টেম্বর।

প্র্রজ্ঞাপনের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিএনপি ও তার সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর নানা কর্মীদের স্ট্যাটাসে বলা হয় – প্রধান বিচারপতির নিয়োগ নিয়ে অবৈধ অসাংবিধানিক কর্মকান্ড হচ্ছে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি দেশে নাই। ওনার অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের মত সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রক্রিয়াটি বৈধ নয়।

এধরনের বিভ্রান্তিকর খবর প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বলেন, ‘প্রধানবিচারপতি নিয়োগের একান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির। এরজন্য তার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও পরামর্শের দরকার পড়ে না। ফলে উনি দেশে আছেন বা নেই সেটি কোন ইস্যু হতে পারে না। কেউ যদি ন্যূনতম আইন জেনে থাকে তাহলে এধরনের বক্তব্য প্রচার করতো না।’

তবে শপথ যেদিন হবে সেইদিন রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই থাকতে হবে বলে উল্লেখ করেন আপিল বিভাগের সাবেক এই বিচারপতি। তিনি বলেন, ‘কারো যদি আইনে ও সংবিধানে জ্ঞান থাকে তবে এধরনের অবান্তর অবিশ্বাস্য কথা বলতে পারার কথা না। আমরা দেখছি বিএনপি সবসময়ই এধরনের বক্তব্য প্রচার করে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করে।

সত্যবাদী কে? বিএনপি নাকি গণতন্ত্র মঞ্চ?

বর্তমান সরকারের পতনের এক দফা দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বলছেন, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া একদফার আন্দোলন চালিয়ে নিতে বলেছেন। অথচ বিএনপির মহাসচি এই দাবি প্রত্যাখান করেছেন। বলেছেন, খালেদা জিয়া কোনো নির্দেশনা দেননা। মির্জা ফখরুলের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। দুই শরিক দলের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে রীতিমত দ্বিধাদন্ধে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। তারা বলছেন- খালেদা জিয়ার ঘোষণা নিয়ে কেন সত্য বলছেন আর কে মিথ্যা বলছেন? এর উত্তর খুঁজছেন তারা।

গত মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যান জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বাবুল, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম।

খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ শেষে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না সাংবাদিকদের বলেন, ‘খালেদা জিয়া বলেছেন আপনারা যারা বাইরে আছেন তারা সবাই মিলে আন্দোলন করেন। আমি দেখতে চাই আপনার আন্দোলন করছেন, আন্দোলন করতে হবে। আমাদের এই আন্দোলনে ওনার

সমর্থন আছে। আমাদের একজন নেতা বলেছেন সরকার একটা নির্বাচনের জাল বিছানোর চেষ্টা করছে। উনি বলেছেন, কোনো অবস্থায় এই সরকারের অধীনে নির্বাচনী ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।’

চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এখন দলীয় কোনও নির্দেশনা দেন না বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালে নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, ‘খালেদা জিয়া আন্দোলনের কোনো নির্দেশনা দেন না। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আছেন, স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে- সেভাবেই দলের সিদ্ধান্ত হয়। চেয়ারপারসন অসুস্থ। তিনি কোনো দলীয় নির্দেশনা দেন না। তাকে নিয়ে এসব কাজ করবেন না।’

এবিষয়ে জানতে চাইলে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, ‘আমি সেদিনই বলেছি, খালেদা জিয়া রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার পরিস্থিতিতে নেই। আমরা তার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কিছু কথা বলেছেন। বলেছেন, আন্দোলন বিশেষ কোন দলের না। দেশে যেনো আর কোনদিন এরকম পরিস্থিতি না আসে সেটার জন্য আন্দোলন।’বিএনপির মহাসচিব তাহলে খালেদা জিয়া কোন সিদ্ধান্ত দেন না বলে সাংবাদিকদের কাছে দাবি করলেন কেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘হয়তো ডে-টু-ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি নেই বলে একথা বলেছেন।’

বিশেষ সুবিধা ভোগের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে এক দফা আন্দোলন করলেও বিএনপি ও গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের মুখোশ জনগণের সামনে উন্মোচন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নূহ উল আলম লেনিন। তিনি বলেন, ‘ওদের সিদ্ধান্ত আসে লন্ডন থেকে। খালেদা জিয়া যদি বলে থাকেন যে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন নয়- তবে সেটা তিনি কতটুকু জেনে বলেছেন তা বিবেচনার বিষয়। কেননা তিনি ততটুকুই জানেন, যতটুকু তার নেতারা তাকে জানায়। একেক নেতা একেক জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দিয়ে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করছেন, তাদের নিজেদের মধ্যেকার দূরত্ব জনগণের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে ‘

গত ৯ই আগস্ট শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বেগম খালেদা জিয়াকে। এরপর থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ৭৮ বছর বয়সী বিএনপি নেত্রী লিভার

সিরোসিস, আর্থাইটিস, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্রে জটিলতা, ফুসফুস, চোখ ও দাঁতের নানা সমস্যায় ভুগছেন। এছাড়া তার মেরুদণ্ড, ঘাড়, হাত ও হাঁটুতে বাতের সমস্যাসহ আরও কিছু শারীরিক জটিলতা রয়েছে।

দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হয়ে খালেদা জিয়া ২০০৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদন্যতায় ২০২০ সালের ২৫ মার্চ তাকে সাময়িক মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর থেকে খালেদা জিয়া তার গুলশানের বাসায় অবস্থান করছেন। আর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বাংলাদেশ আ.লীগ কোন মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করেনি

‘৯৭ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিশ্চিত যাদের’ এমন চটকদার শিরোনামে বিভিন্ন অনলাইন পোর্টালে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসকল সংবাদ নিয়ে ভুয়া মনোনয়ন প্রাপ্তদের অনুসারীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনন্দন জানিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে এবং দলের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে।
এসকল সংবাদকে গুজব ও বিভ্রান্তিকর নিউজ উল্লেখ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এ নিয়ে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে ইমেইলে নোটিশ করতে বলা হয়েছে।
পেজটিতে বলা হয়েছে:
গুজব ও বিভ্রান্তিকর নিউজ
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এধরণের কোন তালিকা প্রকাশ করেনি।
যারা বার বার এধরণের তালিকা বা মনোনয়ন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য অসৎ। এসব গুজব দেখলেই পেজে ইনবক্স করুন অথবা মেইল করুন info@albd.org এই ইমেইলে।

আদালতে আদিলুরের অপরাধ প্রমাণিত: ইউরোপীয় পার্লামেন্ট প্রস্তাবের কী হবে?

বাংলাদেশের আদালতে আদিলুরের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অথচ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এক যৌথ প্রস্তাবে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে অধিকারের বিষয়ে সাতটি বিষয় উল্লেখ করা হয়। আইনজীবীরা বলছেন, মানবাধিকারের কথা বলে অধিকার সংগঠনটি দেশকে অস্থিতিশীল করতে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলো। সেটাও মানবাধিকারপরিপন্থী। তাই ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তুাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২০১৩ সালে তথ্য প্রযুক্তি আইনে ঢাকার মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে অভিযান নিয়ে তথ্য বিকৃতির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় বৃহস্পতিবার মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান শুভ্র এবং পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিন এলানের দুই বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াতের আদালত এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় আদালত প্রাঙ্গণে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা দূতাবাসের প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

একইদিনে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চর্চার বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়। সেখানে মানবাধিকার সংস্থা ’অধিকার’ বাংলাদেশে একটি এনজিও যার নিবন্ধন বাতিলসহ এক দশকেরও বেশি হয়রানির শিকার হয়ে আসছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের সময় মানবাধিকার রক্ষার কথা বলে কিন্তু সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো সরকারের দ্বারা হয়রানি ও নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ওই প্রস্তাবে মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে

প্রত্যাহার এবং সংগঠনটির নিবন্ধন পুনরায় চালু করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে বাংলাদেশের আদালতে অধিকারের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এখন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাব কতটা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মানবাধিকারের কথা বলে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট যে প্রস্তুাব দিয়েছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন আইনজীবী রানাদাশগুপ্ত। তিনি বলেন, মানবাধিকারের কথা বলে অধিকার সংগঠনটি দেশকে অস্থিতিশীল করতে পারে এমন মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলো। সেটাও মানবাধিকারপরিপন্থী।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলাম সমাবেশ করে। পরে সমাবেশস্থলে রাত্রিযাপনের ঘোষণা দেন সংগঠনের নেতারা। তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে যৌথ অভিযান চালায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ওই অভিযানে ৬১ জন নিহত হয় বলে দাবি করেছিল অধিকার। তবে সরকারের ভাষ্য, সেই রাতের অভিযানে কেউ মারা যায়নি। পরবর্তীতে ৬১ জন নিহতের তালিকার সত্যতা পাওয়া যায়নি।

তদন্ত শেষে ওই বছরের ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার আদালতে আদিলুর ও এলানের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। এতে ৩২ জনকে সাক্ষী করা হয়। ওই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর মামলাটি বিচারের জন্য অভিযোগ আমলে নেন ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল। এরপর ২০১৪ সালে দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামি আদিলুর ও এলান ৬১ জনের মৃত্যুর ‘বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা’ তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচার করে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নের অপচেষ্টা চালায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সরকার ও রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি দেশে-বিদেশে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করে।

পদ্মা সেতু: ২১ জেলার কৃষিতে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন

ফেরি সংকটে অথবা আবহাওয়াজনিত জটিলতা, অথবা যানজটে পড়ে পদ্মা নদী পার হতে না পেরে তরমুজ বোঝাই শতাধিক গাড়ি আটকে পড়ার কাহিনী কারও অজানা নয়। শুধু তরমুজই নয়, মাদারীপুর থেকে আনা কলাই শাক, শরীয়তপুর থেকে আনা নানা ধরনের সবজি, ফরিদপুর থেকে আনা খেজুরের রস, বরিশাল ও পটুয়াখালি থেকে আনা তরমুজ, বাঙ্গি, আমড়া ও মুরগির ডিমবাহী ট্রাকও পদ্মার পাড়ে আটকে থাকত, ঘণ্টা পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। ফলে এসব পচনশীল পণ্য গরমে নষ্ট হয়ে যেতো। যা ফেলে দিতে বাধ্য হতেন ব্যবসায়ীরা। আবার কেউ কেউ এসব পণ্য কম দামে বিক্রি করে দিয়ে লোকসানের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে বাড়ি ফিরতেন খালি হাতে।

পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর এমন পরিস্থিতির অবসান হয়েছে বলে স্বস্তিতে পদ্মার পাড়ের কৃষিজীবী মানুষের। ২১ জেলার কৃষিতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বাড়ছে চাষাবাদ। বাড়ছে কৃষিনির্ভর খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন। জমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হচ্ছে সেসব কৃষিপণ্যের চাষাবাদ। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাত সহজ হয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় ক্রেতাও মিলছে আগের তুলনায় বেশি। চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তনে সাফল্য দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে পদ্মা সেতু। মাত্র এক বছরেই পদ্মা সেতু বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের শুধু যোগাযোগের সুবিধাই নয়, গোটা দেশের অর্থনীতি-সহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। সেতু পার হতে এখন সময় লাগে মাত্র ৬ থেকে ৭ মিনিট। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৈত্রিক নিবাস রাজধানী ঢাকা থেকে দেড়শ’ কিলোমিটার দূরে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি নিজেই এখন হেলিকপ্টার ছেড়ে কারে, গাড়িতে চেপে বাড়ি যান। পদ্মাপাড়ে গিয়ে জলখাবার খান।

এই পদ্মা সেতুতে রেললাইন জুড়ে যাওয়ায় এরইমধ্যে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলার ভাঙা থানা পর্যন্ত রেল চলাচল দ্রুতই শুরু হচ্ছে। এই রেললাইন সংযুক্ত হবে যশোর পর্যন্ত। এর ফলে যোগাযোগ আরও সহজ হবে। এছাড়া বর্তমানে ঢাকা-কলকাতা ৫০০ কিলোমিটারের পরিবর্তে দূরত্ব দাঁড়াবে আড়াইশ’ কিলোমিটার। রেলে চড়ে কলকাতা পৌঁছানো যাবে ৬ ঘণ্টার মধ্যেই। ভোগান্তি দূর হবে রোগী-সহ পড়ুয়াদের।

আগে পদ্মা নদী পার হতে সময় লাগতো দেড় থেকে দু’ঘণ্টা। এখন রাজধানী ঢাকা থেকে মানুষ বাসে করে বেনাপোল-পেট্রাপোল পৌঁছায় সাড়ে চার ঘণ্টায়। আগে এই সময় লাগত ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা। আর আবহাওয়া খারাপ থাকলে তো কথাই নেই। ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। এখন পদ্মা সেতুর জন্য কৃষক যেমন তাঁর ফসল দ্রুততার সঙ্গে রাজধানী ঢাকায় পাঠিয়ে কাঙ্খিত মূল্য পাচ্ছেন, অপরদিকে মানুষ দ্রুততার সঙ্গে গন্তব্যে পৌঁছতে পারছেন।

গত বছরের ২৫ জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়। ২৬ জুন থেকে সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সেতু চালুর পর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের আগের মতো আর ফেরিঘাটে ৪/৫ ঘণ্টা অসহনীয় ভোগান্তি নেই। কাজ শেষ হলে ফেরি ধরার তাড়াও নেই। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের নতুন প্রাণ দিয়েছে এই সেতু। এখন খুব সহজেই মানুষ রাজধানী ঢাকায় থেকে নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে পারছেন। গত এক বছরে ম্যাজিকের মতো বেড়েছে এই জনপদের জমির দাম। উন্নত হয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার মান। সেতুর দুই পাড়ের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-পর্যটন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের বিকাশ ঘটেছে। পদ্মার এপার ও ওপারের কৃষি ও শিল্পপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা দ্রুত হচ্ছে। সেতুকে কেন্দ্র করে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে পড়ছে ইতিবাচক প্রভাব।

গত এক বছরে পদ্মা সেতুতে টোল আদায় হয়েছে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার বেশি। সেতু বিভাগ জানায়, ২০২২ সালের ২৬ জুন ভোর ৬টা থেকে শুরু হওয়া পদ্মা সেতুতে চলতি বছরের ২০ জুন পর্যন্ত ৩৬২ দিনে ৫৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৪৯টি গাড়ি যাতায়াত করেছে। ওইসব গাড়ির টোল থেকে আয় হয়েছে ৭৯০ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। আয় থেকে ৬২২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করেছে সেতু কর্তৃপক্ষ।